নক্ষত্রের রাত

মতি নন্দী

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

।। এক ।।

ছোট ছোট তিনটে শব্দ করে দিনেশের কড়ানাড়ার অভ্যাস। রমা তখন শাড়ি বদলাবার জন্য আটপৌরেখানা আলনা থেকে নামাচ্ছিল, কিন্তু দিনেশের ফেরার শব্দ শুনে ঘরের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়াল। চোখটুকু বার করে অপেক্ষা করতে লাগল কখন মাধবী দরজাটা খুলে দেবে। দরজা কে খুলবে তার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, কাছে যে থাকে সেই খুলে দেয়। কিন্তু এখন রমার সাধ্যে কুলোল না ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। কে জানে কেমন খবর এনেছে দিনেশ।

দুটো লাগোয়া ঘরের সঙ্গে অন্ধকার-অন্ধকার দালানটার একদিকে রান্নাঘর, আর একদিকে দরজা। দরজাটা পলকা। কড়ানাড়ার সঙ্গে ওর কব্জাগুলোও কাঁপে। তখন বাড়তি আর একটা শব্দ হয়, কিন্তু দিনেশের কড়ানাড়ার মেজাজ এমনই যে বাড়তি শব্দটা আর হয় না। শুধু এইটুকু দিয়েই ওকে চিনে নেওয়া যায়।

কড়া দিনেশ নাড়ছে তাই ব্যস্ত হ'ল না মাধবী। বিছানা থেকে টান দিয়ে পরিষ্কার সুজনিটা তুলে নিল। ছেঁড়া তোশক বেরিয়ে পড়ল। বালিখসা দেয়াল, বার্ণিসচটা খাট, সিমেন্ট ফাটা মেঝে, নড়বড়ে একটা চেয়ার আর টেবিল, ঝাপসা গোটাকতক ছবি, এসবের মধ্যে পরিষ্কার সুজনিটা বেখাপ্পা দেখাচ্ছিল। মাননীয় বিদেশী অতিথিদের চোখ থেকে শহরের ময়লা এলাকা ঢাকবার আপ্রাণ চেষ্টারই একটা ছোট ধরনের উৎসাহ যেন এতক্ষণ ছিল। সুজনিটা তুলে নেওয়ায় ঘরটা স্বাভাবিক হল।

আর একবার কড়া নাড়ল। নড়ুকা মাধবী ভাঁজ করতে শুরু করল সুজনিটা। পাশের ঘরে রমা আছে, খুলে দেবে। খাটের তলা থেকে ময়লা জামাকাপড়গুলো বার করে দড়ির আলনায় গুছিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ তার মনে হল, দিনেশ যেন অন্যবারের তুলনায় শিগ্‌গির ফিরে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি কি কথাবলা শেষ হয়ে গেল, না কথা না-বলেই শুধু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল!

মাধবী দরজা খুলল। খিল খোলার শব্দে একবার শুধু কেঁপে উঠল রমা।

—কি বলল?

দিনেশকে ঢুকতে না দিয়ে, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় মাধবী জিগ্যেস করল।

—বলেছিলে তো?

—হ্যাঁ। বলল পরে জানাবে।

কথাটা বলেই দিনেশ ঢুকতে চাইল। মাধবী নড়ল না।

—হাবভাব দেখে কি মনে হল, পছন্দ?

—কি জানি।

—দেনা পাওনার কথা বলল কিছু?

—না।

—তাহলে কি করলে এতক্ষণ!

মাধবী সরে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে দিনেশ ওর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকল। যেন সব দোষটুকু তারই। মাধবী তাকিয়ে আছে। ঘেন্না করছে। তাকে অপদার্থ ভাবছে। মিষ্টি কথায় পাত্রপক্ষের মন ভেজাতে না পারলে, কাজ বাগাতে না পারলে তাকে অপদার্থ ভাবতে মাধবীর একটুও দ্বিধা হবে না। ও এমন ধরনের মেয়েমানুষ।

কাঁধের হাড়গোড়ের মাঝে দিনেশের মাথাটা যেন আর একটু বসে গেল। দিনে দিনে ক্রমশ সে ছোট হয়ে আসছে।

আটাশ বছর আগের বিয়ের ছবিটা এখনো দেয়ালে ঝুলছে। দিনেশের পরিষ্কার মনে আছে কোথায় তোলা হয়েছিল ছবিটা। বিয়ের পরদিন রওনা হবার আগে, মাধবীর বাপের বাড়ির পাশের বাড়ির উঠোনে জোড়ে ছবিটা তোলা হয়েছিল। ওর অনেকগুলো কপি মাধবীর বাবা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিলি করেছিল। কেউ কেউ নিজেদের ঘরে বাঁধিয়েও রেখেছিল। এখন, আটাশ বছর বয়েসী কাঁচের ওঁধার থেকে ছবিটা, যে কোন দম্পতির নামে খবরের কাগজে ছাপা যেতে পারে। এত ঝাপসা!

মাঝে মাঝে দিনেশ ভাবত কাচটা পরিষ্কার করে দেবে। দেওয়া হয়নি। কেমন আলসেমিতে ধরে। এতে তার কি লাভ হবে। ছেলে-মেয়েরা অবাক হবে শুধু, তাদের বাবার জোয়ান বয়সের চেহারা দেখে। রীতিমত সাঁতার-কাটা স্বাস্থ্য। এখন আর কেউ বিশ্বাস করবে না। না করলে কিছু লোকসান নেই। ছবিটার আজ কোন ধরনেরই মূল্য নেই। যে জিনিসের থাকা না-থাকা সমান, তার সম্পর্কে আলসেমি আসা স্বাভাবিক।

আজ কতদিন পরে ছবিটা যে ঘরে আছে, সে খেয়াল হল। চেয়ারে বসে দিনেশ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ছবিটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না। ওটার কোন অর্থ নেই। এমন একটা অর্থহীন জিনিস যে এতদিন মাধবীর নজরে পড়েনি, এইটেই আশ্চর্যের। লাভ লোকসান না খতিয়ে তো মাধবী চলে না। যারা খতিয়ে চলে তারা বোধহয় এর মাঝামাঝিগুলোকে আমল দেয় না। আমাকেও ও আমল দেয় না। আমি লাভ লোকসান মেপে চলি না, চললে বোধহয় আরো চালাক চতুর হতে পারতুম; সংসারের এই হাল হত না। উৎসাহ থাকলে চালাক হওয়া যায়। মহিম আজ নিজের বাড়িতে অফিস করেছে, বাড়ির সামনে মোটরের ভিড় জমে। অথচ ও স্কুলে কি বোকাটাই না ছিল! স্কুল ছাড়লুম একসঙ্গেই প্রায়। আমি চাকরিতে ঢুকলুম, আর ও জ্যোতিষী মামার সাগরেদি শুরু করল। মহিমের সব কিছুতেই উৎসাহ ছিল। আজও আছে। আজও আগের মত ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলে, সাংসারিক পরামর্শ দেয়, আর সে পরামর্শ শুনলে লাভ ছাড়া লোকসান যে হবে না, তাই বোঝাতে নিজের দিকে আঙুল দেখায়। গল্পের মত শুনতে লাগে। নতুন টাকা আর আংটিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেও বেশ লাগে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাইরে

এসেই ভুলে যাই। কি হবে মনে রেখে? টাকা করার পথ বড় নোংরা। তার থেকে অনেক ভাল চুপচাপ যেমন আছি তেমনি থাকা।

চেয়ারে বসেই হাতের কাছে যে বইটা পেল তুলে নিল দিনেশ। বিবেকানন্দের চিঠি। কয়েক পাতা উলটিয়ে আর একটা তুলল। শরৎ গ্রন্থাবলী। মনোযোগ করল।

এখন রাগ করে কোন লাভ নেই তবু রাগ হল মাধবীর। দিনেশের দোষ নেই। তারা যদি রমাকে না পছন্দ করে তাহলে কি-ই বা সে করতে পারে। কিন্তু একটা কিছু তো করা উচিত। মুখ বুঁজে বই পড়লেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। কিছু না পারুক অন্তত ভাবুক। চেঁচিয়ে সেই ভাবনার কথাটা জানাক। যত ভাবনা একাই ভেবে মরব; ওর কি কোন দায় দায়িত্ব নেই। সংসার খরচের কটা টাকা ফেলে দিয়েই খালাস! ঘাড় গুঁজে বই পড়ছে কেমন নিশ্চিন্তে। এত বড় যে একটা বোঝা ঘাড়ে চেপে আছে সে খেয়াল নেই। অন্যের ভাবনা বইয়ে লেখা আছে। তাইতে ডুবে গেছে। অন্যের ভাবনা ভেবে কি লাভ!

মাধবী শব্দ করে দরজায় খিল দিল।

সেই শব্দে আর একবার কেঁপে উঠল রমা। চোখ বুঁজে এল। এবারেও তাকে অপছন্দ করেছে। এই নিয়ে তিন'বার হল। লজ্জা করছে। সেজেগুজে কতকগুলো অপরিচিত লোকের সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকা। বাঁধা মামুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। আর মায়ের রাগ দেখা। এত করেও কিছু হল না। আমার জন্যেই মা রাগে, বাবা মাথা গুঁজে বই পড়ে। এখনকার এই মনকষাকষি, অশান্তি আমার জন্যেই। আমায় অপছন্দ করেছে, তার মানে ওদের চোখে আমি কুচ্ছিত। নিজেকে কুচ্ছিত ভাবতে লজ্জা করে। এখবর পাঁচজনে শুনলে নানান কথা বলবে, দয়ার কথা।

আয়নার সামনে দাঁড়াল রমা। জায়গায় জায়গায় পারা উঠে শুকনো পোড়া ঘায়ের মত দাগ ধরে আছে। খোঁপায় আঙুল চেপে কাঁটাগুলো বসিয়ে দিলে। আয়নার আধখানা কাঁচ অদ্ভুত। মুখটা লম্বাটে দেখায়। দেখলে ভয় করে। হয়তো ভয় পেয়েছিল। ঘরে ঢুকেই ভ্রূ তুলল মাধবী।

—কাপ ডিশগুলো তখন থেকে ও ঘরে পড়ে রয়েছে, পরের জিনিস ফেরত দিতে হবে না?

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোচ্ছিল রমা। আরো বিরক্ত গলায় মাধবী বলল—

—কাপড়টা ছাড়বি কখন?

খেয়াল হল রমার। কাপড়টা আগেই তুলে রাখা উচিত ছিল। লোকজনের সামনে বেরোবার মত এই একখানাই শাড়ি আছে। যদি দাগ ধরে বা ছেঁড়ে! এবার গলার স্বর ইচ্ছে করেই চড়িয়ে মাধবী বলল—

—বাহার দেওয়া হচ্ছে। যেন হাজার গণ্ডা শাড়ি কিনে দিয়েছে। তোলাগুলো পরে পরে আর একখানাও তো আস্ত নেই।

—এই একখানাই তো তোলা শাড়ি! আর ছিল নাকি?

—থাকবে কি করে? আমার বাপ তো তোর বাপের মত নয়, তোরঙ্গ ভর্তি করে শাড়ি দিয়েছিল। দিতে জানা চাই, বুঝলি—

মাধবী এই যে শুরু করল, যতক্ষণ না দিনেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে আর থামবে না। প্রতিদিনের ঘটনা। একটা ছুতো পেলেই হয়। রমা তাড়াতাড়ি বদলে নিল শাড়ি। তোরঙ্গের শেষ তলাতে পাট করে বিছিয়ে রাখতে হবে। রমার হাত থেকে মাধবী সে কাজটুকু তুলে নিল।

পাশের ঘরে এসে রমা ঢুকল। দিনেশ বেরিয়ে যায়নি। ছুটির দিন আজ। বিকেলের আলোও যাই যাই শুরু করেছে। জানলা থেকে টেবিল পর্যন্ত শুধু স্পষ্ট নজর করা যায়। নয়তো চোখ টান করে বাকি ঘরটুকুতে তাকাতে হয়।

মাথা ঝুঁকিয়ে বই পড়ছে দিনেশ। মাধবীর কথাগুলো নিশ্চয় কানে গেছে।

—বাবা, বাইরে যাবে না?

নরম গলায় বলল রমা। কিন্তু তাই বলে এত নরম নয় যে উত্তর পাওয়া যাবে না।

—বিকেল হয়ে গেছে। একটু ঘুরে এসো।

এবার পাশে দাঁড়িয়ে রমা বলল। একটু বেশি রকমের চমকাল দিনেশ। রমা বুঝল এতক্ষণ বই পড়ছিল না।

—বেশ লাগছে পড়তে।

—ওতো তোমার কতবার পড়া বই।

—তবু বেশ লাগে। এক একবার, এক একরকম লাগে।

হাসল দিনেশ। বড় ঠাণ্ডা হাসি। রমার কষ্ট লাগে এই ছোটখাট মানুষটার জন্য। কটুকাটব্যগুলো নির্বিবাদে হজম করেও হাসতে পারে। তখন চোখে চোখ রাখলে মন জুড়োয়। মন খারাপও হয়। হাসির কথায় হাসে না। হাসবেই বা কোত্থেকে। সংসারে হাসির কথা হয় নাকি!

দিনেশ তাকিয়ে আছে। ঘরের আলো এখন অনেক কম। তবু মুখের দিকে তাকান যায় না। জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে চোখ দুটো। চোখ সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল রমা।

দরজা পেরোলেই সরু একফালি জায়গা। একধারে ওপরে যাবার সিঁড়ি। আর একধারে উঠোন। সিমেন্টের রক উঠোন ঘিরে। রকের ধারে আর দুটো ঘর। যমুনারা থাকে।

উঠোনের একধারে কলতলা। বাইরে আর ভেতরে দুটো চৌবাচ্চা পুরুষ আর মেয়েদের জন্য। মেয়েদেরটা পাঁচিলঘেরা টিনের চালা দেওয়া। বাসন মাজার কাজে বাইরেরটার ব্যবহার হয়। কাপগুলো ধুয়ে যমুনার দরজায় এসে রমা দাঁড়াল।

চুল বাঁধছিল যমুনা। ভেতরে ডাকল সে রমাকে। ছিমছাম থাকতে যমুনা ভালবাসে। ছেলেপুলে হয়নি। সে আর স্বামী। স্বামীর রোজগার ভাল। খাট, পুরু গদী, আয়না লাগান আলমারী, ঘেরাটোপে ঢাকা সুটকেশ, সবকিছুই এ বাড়ির অন্যদের থেকে সিজিল-মিছিল।

নিজেকেও যমুনা সাজগোজে অন্যদের থেকে তফাত করে রাখে। আজ তিন বছর আছে, তবু কেউ মন খুলে ওর সঙ্গে মিশতে পারল না।

মাধবী যমুনাকে পছন্দ করে না। কিন্তু মুখে তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না। ওর ঘরে রমার যাওয়া সে একদম পছন্দ করে না। কিন্তু মুখ ফুটে বারণও করেনি। যমুনার গ্রামোফোন আছে। গানগুলো রমার মুখস্থ। গুনগুনিয়ে দু'একটা কলিতে সুর তুললেই কপালে ভাঁজ ফেলে মাধবী তাকায়। রমার গান থেমে যায়। দু'একবার চুল বেঁধে দিয়েছিল যমুনা নতুন কায়দায়। মাধবী অবাক চোখে তাকিয়েছিল খোঁপার দিকে। রমা আর চুল বাঁধেনি যমুনার কাছে। সিনেমা দেখে এসে গল্প বলে যমুনা। এমন করে বলে যেন চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে রমার। কিন্তু মুখফুটে মাধবীকে বলতে সঙ্কোচ হয়।

রমা বোঝে যমুনার স্বচ্ছল অবস্থাকে সহ্য করতে পারে না মাধবী। তাই রাগ উসকে ওঠে। কিন্তু দায়ে-অদায়ে, টুকিটাকি সাহায্যের জন্য হাত পাততে হয়। রাগ আর অনুগ্রহ চাওয়া, এই দু'য়ে মিলে মাধবী শুধু ভদ্র সম্পর্কটুকুই রাখতে চায়। আর যতটুকু ঘনিষ্ঠ হলে এই সম্পর্ক বজায় থাকে, তার বেশিতেই মাধবীর শাসন। তাই দরকার না পড়লে যমুনার ঘরে আসার উপায় নেই।

—কি, বলে গেল কিছু?

ফিতেটাকে দাঁতে চেপে আয়নায় চোখ রেখে যমুনা জিগ্যেস করল। রমা হাসল। কাপগুলো সাজিয়ে রাখল তাকে। ফিরে দাঁড়াল যমুনা।

—নাকি এবারেও সেই আগের মতন। পরে চিঠি দিয়ে জানাব!

মাথা নাড়ল রমা। তাতে হ্যাঁ এবং না দুই-ই বোঝায়। যমুনা কি বুঝে শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। রমা দরজার দিকে তাকাল। অস্বস্তি ভোগ করার আগেই সে চলে যেতে চায়।

—যাই বৌদি। কাজ পড়ে আছে।

—উনি বলছিলেন চুঁচড়ো না কোথায় যেন একটা মেয়ে জলে ডুবে মরেছে।

—কেন?

—বাপ-মাকে রেহাই দেবার জন্য। এখনো এসব হয়।

—যাই বৌদি।

—আমার বেলায় হয়েছিল কি, যারাই দেখেছে পছন্দ করেছে। কিন্তু বাবার এক গোঁ, কারুর খাঁই মেটাব না। মেয়েতো কুচ্ছিত নয়।

হাসল যমুনা। পানখেয়ে দাঁতগুলোকে ফোকলা দেখায় এই অন্ধকার-অন্ধকার আলোতে। নয়তো মুখের গড়ন ভাল।

—তোমার দাদা নিজে এসেছিল আমায় দেখতে।

হাতের প্যাঁচে চুলগুলোকে কায়দা করে ফেলল যমুনা। বেশ ঘন চুল। রমা তাকিয়ে রইল চুপ করে।

—পাত্তর নিজে আসে নি?